# বাংলা নাট্যধারার ক্রমবিবর্তনে পদাবলী কীর্তনের আঙ্গিক বিচার ও পরবর্তী নাট্য-আঙ্গিক বিকাশে এর ভূমিকা

বাংলার দীর্ঘ দিনের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্তে, কণ্ঠে সম্মেলক কীর্তনের সুর নিয়ে নদের নিমাই ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে 'সঙ্কীর্তনৈকপিতরৌ' অর্থাৎ সংকীর্তনের জনক আখ্যা দেওয়া হয়। তবে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেও পদাবলী কীর্তনগানের মাধ্যমে পরিবেশিত হত। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ গান বাঁধত কবিতা ও পদ বা পদাবলীর আকারে। ধর্ম ছিল মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে ধর্মীয় আবেগ যুক্ত থাকাটা নতুন নয়। ধর্মের সঙ্গে মানুষের গভীর আবেগ যুক্ত আছে বলেই হয়তো ধর্মীয় শ্লোক সুর করে গাইবার রীতি প্রায় সব ধর্মে লক্ষ করা যায়। ধর্ম এবং মরমী ভাবনার সঙ্গে গানের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। তবে মনে রাখতে হবে সংগীতের ধর্ম বহীর্মুখীনতা। সেই সূত্রে অস্তিত্ব কায়েম হয় শ্রোতা ও শ্রোতৃবর্গের। কালক্রমে তাদের (শ্রোতা-দর্শক) গুরুত্ব এতটাই অধিক হয় যে সংগীত উপস্থাপনার সঙ্গে শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনের বিষয় এতে যুক্ত হয়। সংগীতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তৈরি হয় নৃত্য, বাদ্য এবং সর্বোপরি অভিনয়ের। গানে একধরনের দৃশ্যনির্ভরতার বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়। বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার সূত্র এতেই নিহিত রয়েছে।

কীর্তন এক গভীর ধর্মীয় আবেগ থেকে জন্ম নিয়েছিল। বাংলার ঐতিহ্যবাহী আসরকেন্দ্রিক নাট্য-উপস্থাপন ছিল কাব্য-সংগীত-নৃত্য-বাদ্য মিশ্রিত সংরূপ। তাই বর্তমানে প্রচলিত নাটকের ধারণা দিয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা বিচার করা হয়তো ঠিক হবে না। সংগীত, নৃত্য ও বাদ্যসহকারে সেই সময়ের (প্রাচীন ও মধ্যযুগের) সাহিত্য অর্থাৎ কাব্য, পদাবলী ইত্যাদি আসরে আসরে উপস্থাপিত হত। আসরে পরিবেশিত সাহিত্য হয়ে উঠত নাট্যগুণান্বিত। এই সাহিত্যকে যেমন কাব্য অথবা পদাবলী রূপে পাঠ করা হয় তেমনই উপস্থাপনের বিচারে তা হয়ে ওঠে নাটক। মনে রাখতে হবে, সেই সময় ছাপাখানা ছিল না। পুথির লিপিকরদের সংখ্যাও নির্ভর করত পৃষ্ঠপোষকতার উপর। আসরে উপস্থাপনের উপর সম্প্রচার এবং কবির সুনাম অনেকাংশে নির্ভর করত। মানুষের মুখে মুখে এবং স্মৃতিতে ভর করে চলত সম্প্রচার। পদাবলী মনে রাখার ক্ষেত্রেও পদাবলী কীর্তন গান বিশেষ সহায়ক। এইভাবে বিদ্যাপতির

পদাবলী বাংলায় প্রবেশ করে এবং গানে গানে তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে অধিষ্ঠিত হন। মিথিলায় পড়তে যাওয়া ছাত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিতে ধারণ করে অথবা লিখে আনা পদাবলীর মাধ্যমে বিদ্যাপতি বাংলায় প্রচার পান।

পদাবলী কীর্তন সম্পর্কিত গবেষণামূলক কাজ এই প্রথম নয়। বরং গবেষণার জগতে পদাবলী কীর্তন বহু চর্চিত বিষয়। শ্রদ্ধেয় ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ড. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, কৃষ্ণা বক্সী ও আরও অনেকেই কীর্তন নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করেছেন। তাঁদের গবেষণাকর্মের বহু তথ্য আলোচনাপর্বে যুক্ত হয়েছে। প্রায় সকলেই কীর্তনকে সংরূপগতভাবে সংগীত রূপেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত গবেষণা হয়েছে তাতে ভক্তিভাবের প্রাধান্য এতটাই অধিক যে কীর্তনের নাটকীয় বৈশিষ্ট্য অধরাই থেকে গেছে। এই গবেষণাকর্মে উঠে এসেছে কীর্তনের অন্য এক রূপ। এই রূপ নাটকের। পাশাপাশি জানার চেষ্টা করা হয়েছে কীর্তনের মতো এমন একটি শক্তিশালী নাট্যসংরূপ অষ্টাদশ থেকে বিংশ শতাব্দীর নাট্যধারাকে কতটা প্রভাবিত করেছিল। গ্রাম-শহরের ভেদাভেদ তুচ্ছ করে এখনও কীভাবে একটি নাট্য-আঙ্গিক রূপে পদাবলী ও লীলাকীর্তন স্বমহিমায় বিরাজিত রয়েছে তার হদিশ সেভাবে লিখিত আকারে পাওয়া যায় না। এই দিকগুলির উপর আলোকপাত করার জন্যই এইধরনের গবেষণাকর্মের আয়োজন।

দশম শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দী –এক বৃহৎ কালপর্বের কীর্তন সম্বন্ধীয় তথ্য গবেষণায় উঠে এসেছে। আলোচনার সুবিধার্থে গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। পাঁচটি অধ্যায় হল—

প্রথম অধ্যায়— *কীর্তনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বাংলা কীর্তনের বিবর্তন*

দ্বিতীয় অধ্যায়— *বাংলা নাটকের ইতিহাস: উপেক্ষিত অধ্যায় ও মধ্যযুগের বাংলা নাটক*

তৃতীয় অধ্যায়— *কীর্তনের আঙ্গিক বিচার ও নাট্য-আঙ্গিক*

চতুর্থ অধ্যায়— *কীর্তন ও নাট্য-উপস্থাপনা*

পঞ্চম অধ্যায়— *অষ্টাদশ শতক ও পরবর্তী সময়ে বাংলা নাটকের আঙ্গিক বিকাশে পদাবলী কীর্তনের ভূমিকা*

প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে কীর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কীর্তনের আক্ষরিক অর্থ নিরূপণের পাশাপাশি এর আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। কীর্তনের অভ্যুত্থানে ভক্তির তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। কীর্তন সম্বন্ধীয় আলোচনায় ভক্তির প্রসঙ্গ আসবে না, এমন হতে পারে না। কীর্তনের সঙ্গে ভক্তির যোগ সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। ভক্তির পথ ধরে কৃষ্ণভক্তি কীর্তনে প্রধান হয়ে উঠেছে। সর্বভারতীয় পটভূমিতে কীর্তনের যে একটি বিশেষ স্থান ছিল এবং সেই সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গের বাঙালির কাছে ভক্তির স্বরূপ কেমন ছিল তা আলোচনায় উঠে এসেছে। সারা ভারত জুড়ে যে ভক্তিসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল তা কাব্য, কবিতা ও পদাবলীর আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। অনেক পদাবলী ও কবিতাই কালের নিয়মে হারিয়ে গেছে বা লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয়নি। তবে এই কবিতা ও পদাবলী যে গীত হত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সংগীতের সঙ্গে কালক্রমে নৃত্য ও বাদ্যের সংযোগ ঘটেছিল। কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কীর্তনের সর্বভারতীয় প্ররেক্ষাপট আলোচনা করার পর আলোকপাত করা হয়েছে প্রাচীন বঙ্গের দিকে। প্রাচীন বঙ্গের রাজনৈতিক পালাবদলে কৃষ্ণভক্তি কীভাবে তাঁর শেকড় দৃঢ়বদ্ধ করেছিল তার একটি রূপরেখা প্রদান করা গেছে। লিপিলিখনে, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে এবং সর্বোপরি রয়েছে সাহিত্যে (প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য) কৃষ্ণভক্তি তথা কীর্তনের স্বরূপ সন্ধান। সাহিত্য ক্ষেত্রে সংগীতের আধিপত্য লক্ষ করার মতো।

ভক্তিসাহিত্য তথা বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তন ও কীর্তনীয়াদের তিনটি কালপর্ব (চৈতন্য-পূর্ব, চৈতন্যসমসাময়িক ও চৈতন্য-পরবর্তী) ভেদে বিচার করা হয়েছে। এই পদকর্তাদের মধ্যে অনেকেই একাধারে কবি, অন্যদিকে ছিলেন প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া (মূলগায়েন, খোলবাদক ও নৃত্যকলায় নিপুন)। বাংলায় ভক্তিসাহিত্য এবং বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সিংহভাগই যে কীর্তন করার নিমিত্তে রচিত হয়েছিল, তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ধারায় *গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণবিজয়,* বিভিন্ন চৈতন্যচরিত গ্রন্থ এবং বিশিষ্ট পদকর্তা ও তাঁদের বৈষ্ণব পদ আলোচনায় উঠে এসেছে। বঙ্গে কীর্তনের প্রচলন এবং কীর্তনকে মানবমুখী আন্দোলন করে তুলতে চৈতন্যদেব এবং তাঁর অনুচরবৃন্দের ভূমিকা ছিল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। চৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেমধর্ম যেমন পরবর্তী গোস্বামীদের হাতে শাস্ত্রের রূপ নিয়েছিল, তাঁর গানের দলেও তেমনি শাস্ত্রীয় সংগীতে দক্ষ ব্যক্তিবর্গ যুক্ত হন। কীর্তন গানের এক সাংগঠনিক রূপ এই আলোচনাপর্বে উঠে এসেছে। পদাবলী কীর্তনে সংগীতের পাশাপাশি নৃত্য ও বাদ্য

অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠছিল। প্রাচীন কাল থেকেই কীর্তনে দলগত উপস্থাপনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। দলে একজন প্রধান গায়ক থাকতেন। কীর্তনের দলে দোহার, বাদ্যকর ও নৃত্যপটু ব্যক্তিও থাকতেন। সেকারণে পদাবলী কীর্তনকে কেবলমাত্র সংগীত রূপে বিচার করা ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে তিনটি ঘটনাকে গুরুত্ব সহকারে দেখানো হয়েছে। এক, নবদ্বীপে কাজীদলনে নগরকীর্তন। দুই, নীলাচলে রথযাত্রায় কীর্তন। তিন, খেতুরী মহোৎসবে কীর্তন প্রসঙ্গ। তিনটি ঘটনা কীর্তনকে দৃঢ়মূল করতে সাহায্য করেছিল। এখনকার কীর্তনীয়া তথা কীর্তনের গবেষকমহলে বারে বারেই উঠে এসেছে এর (তিনটি ঘটনার) অভিঘাত। এতে তখনকার কীর্তনের স্বরূপ যেমন উঠে আসে তেমনি কীর্তনের উপস্থাপন কৌশলও স্পষ্ট হয়। তিনটি ক্ষেত্রেই দলগত উপস্থাপন প্রাধান্য পেয়েছে। দলে থেকতেন একজন মূলগায়েন এবং একাধিক বাদক (শ্রীখোল, মন্দিরা ইত্যাদি) ও নৃত্যপটু সদস্য।

গবেষণাকর্মের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে বাংলা নাটকের অনাদৃত এবং স্বল্প চর্চিত ইতিহাস। বাংলা নাটকের ইতিহাস কেন পাওয়া যায় না তার বহুমাত্রিক যুক্তি এখানে উঠে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দী কেন নাট্যসাহিত্যের সূচনালগ্ন রূপে নিরূপিত হয়েছে? কেন এর আগের নাট্যমাধ্যমগুলিকে অস্বীকার করা হয়েছে? কেনই বা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করে সরিয়ে রাখার প্রয়াস দেখা যায়? 'ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা নাটকের অস্তিত্ব ছিল না' –এই ধারণা পোষণের কী কারণ ছিল? যাত্রাকে প্রাচীন এবং একমাত্র নাট্যসংরূপ ভাবার পেছনে অভিপ্রায় কী ছিল? —ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মাধ্যমে পদাবলী কীর্তনের নিজস্ব নাট্যঐতিহ্য অনুসন্ধান করা হয়েছে।

নাটকের একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রাচীন বঙ্গে প্রচলিত ছিল। গীত-নৃত্য-বাদ্য সহকারে তা উপস্থাপিত হত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের শ্রোতা-দর্শক কাহিনির অনুসন্ধানে নাট্যরস উপলব্ধি করতেন। তবে পরাধীন বাঙালি পাশ্চাত্যের মোহে এতটাই মজেছিল যে দেশীয় সংস্কৃতি বিচার বিশ্লেষণের সময় পশ্চিমের নাট্যতত্ত্ব দিয়ে তা বিচার করা হয়েছিল। কাব্য, সংগীত, নৃত্য, বাদ্যের পৃথক পৃথক ইতিহাসচর্চার পরিবর্তে এই আলোচনায় উঠে এসেছে একটি সামগ্রিক উপস্থাপিত রূপ। এর উপস্থাপিত রূপটিকে নাটক বলা কতখানি যুক্তিযুক্ত হবে তা এই আলোচনাপর্বে বিচার করা হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রাপ্ত প্রায় সমস্ত লিখিত সাহিত্যই গীত হত। পুথিগুলিতে যে কবি-ভণিতা পাওয়া যায়, তাতে উদাত্ত কণ্ঠে গাইবার উল্লেখ প্রায় প্রতিটি কাব্যে পাওয়া যায়। তাছাড়া ধ্রুবপদের ব্যবহার আসরে গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হওয়াকেই সমর্থন করে। সেই আসর হতে পারে মন্দিরপ্রাঙ্গণ, রাজসভা অথবা সর্বসাধারণের জন্য তৈরি মাটির আসর। পদাবলী গানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলতে নৃত্য ও বাদ্য ছিল সহচর। একটি আসরে একজন অধিকারী তাঁর দল নিয়ে সংগীত-নৃত্য-বাদ্য সহ কাহিনি উপস্থাপন করছেন। এই উপস্থাপন দেখছেন ও শুনছেন কিছু মানুষ। এমন উপস্থাপনের নাটক হতে বাধা কোথায়? দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে হয়তো এমন সহজতা যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরবর্তী ধাপের আলোচনায় বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত প্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শন *চর্যাপদ*-এর কাল (অষ্টম-দ্বাদশ শতক) থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকাল (১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত সময়ের অর্থাৎ, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সাহিত্যিক নিদর্শনে নাট্য-উপস্থাপনের স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে। বিশেষত পদাবলী কীর্তন ক্রমে লীলাকীর্তন বা পালাকীর্তন বা রসকীর্তন হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে নাটগীত এবং লীলানাটকের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। চৈতন্যদেবের নির্দেশনায় নাট্য-উপস্থাপন এক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছিল। চৈতন্যদেব নির্দেশিত লীলানাটক অভিনীত হওয়ার পর পদাবলী কীর্তনের নাট্যধর্মীতা পূর্বের তুলনার বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে লীলাকীর্তনের বিকাশে তা কার্যকরি ভূমিকা পালন করেছে। আলোচনাপর্বের এই অংশে লীলাকীর্তনের উপস্থাপন সেই সময় কেমন ছিল তার একটি সুস্পষ্ট ছবি তুলে ধরা হয়েছে।

নাটগীত সংরূপটি বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গানের মাধ্যমে নাট্য-উপস্থাপন বাংলার একটি প্রাচীন রীতি। *চর্যাপদ*–এ যে বুদ্ধনাটকের কথা পাওয়া যায় তাতে বাঙালির নাট্য-আকাঙ্ক্ষার প্রাচীন রূপ খুঁজে পাওয়া যাবে। গীত-নৃত্য-বাদ্যময় অভিনয় ছিল এর মূল কাঠামো। পরবর্তীকালে নাটগীতের মাধ্যমে *গীতগোবিন্দ* এবং *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে এই অভিনয় উপস্থাপন প্রণালী আরও বেশি সংহত রূপ লাভ করে। দলগত উপস্থাপন ছিল এর মূল বৈশিষ্ট্য। কবি জয়দেবের একটি ঘরোয়া দল ছিল এবং তিনি নিজে ছিলেন অধিকারী। জয়দেব গাইতেন এবং পদ্মাবতী নাচতেন। তাঁর আত্মীয় পরাশর ছিলেন দোহার। অর্থাৎ মূলগায়েন এবং দোহার মিলে সংগীত উপস্থাপন করতেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে ধ্রুবপদের ব্যবহার নাট্য-উপস্থাপনে দোহারের অস্তিত্ব প্রমাণ

করে। গানের বিষয়বস্তু এবং ভাব অনুসারে চলত নৃত্য। নৃত্য পরিবেশনে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হত। বাদ্য বাজানোর জন্য নিশ্চই দলে পারদর্শিতাসম্পন্ন ব্যক্তি নিযুক্ত থাকতেন। সাহিত্যে রয়েছে এর অজস্র প্রমাণ। এমন দলগত উপস্থাপনের রূপটি বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই ধারায় পদাবলী কীর্তন এবং লীলাকীর্তন প্রাচীন বৃহৎ বঙ্গে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অধিষ্ঠান করেছে। আখ্যানধর্মী পাঁচালি জাতীয় রচনার উপস্থাপনেও এই রীতির অনুসরণ ঘটেছে। অভিনয় উপযোগিতা পদাবলীর তুলনায় আখ্যানধর্মী পাঁচালীতে বেশি থাকায় এতে নাট্য-উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। পদাবলী এবং পাঁচালির বাহ্যিক রূপের তফাৎ থাকলেও উপস্থাপনগত সাদৃশ্য যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। বাংলার ক্রমবিবর্তিত নাট্যধারা এই বৈচিত্র্যের সমাবেশে ততোধিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যরূপের স্বরূপ সন্ধান এবং ক্রমবিবর্তনের ধারা সাহিত্যিক নিদর্শনের আলোকে এক ভিন্ন পাঠের সন্ধান দেয়। এই পাঠে বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তনের প্রসঙ্গ। কীর্তনের উপস্থাপনভঙ্গী মধ্যগগনে সূর্যের মতো প্রখর তাপে তাপিত করেছে অন্যান্য নাট্যসংরূপগুলিকে। অন্ততপক্ষে উপস্থাপনভঙ্গীর বিচারে এমনটাই মনে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়ে কীর্তনের আঙ্গিক বিচার করা হয়েছে। কীর্তনকে কেবলমাত্র সংগীত বলা হলে ন্যায় বিচার করা হবে না। কীর্তনের বহু সম্ভাবনাই তাতে নষ্ট হয়। পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তন চরম নাট্যসম্ভাবনাময় সংরূপ। তাই নামকীর্তনকে কেবলমাত্র সংগীত বলা হলেও পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তনকে কখনোই সংগীতের ঘেরাটোপে আটকে রাখা যায় না। নাট্যাঙ্গিক হিসেবে কেন কীর্তন সংরূপটিকে দেখা প্রয়োজন তা এই অংশে আলোচিত হয়েছে। কীর্তনের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কীর্তনে নানা রকমের নাট্যোপযোগিতা রয়েছে। স্থান-কাল ও প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরনের কীর্তন উপস্থাপিত হয়। কীর্তন ও সংকীর্তনের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য নিরূপণের পাশাপাশি এই শ্রেণির নামকীর্তন যে কেবলমাত্র সংগীত রূপেই বিবেচিত হয় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে পদাবলী-লীলা-পালা-রস কীর্তনে নাটকের সমস্ত গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় বজায় রয়েছে এবং তা সম্পন্ন হয়েছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাটকের ধারাকে সজল রেখে। তাই এই শ্রেণির কীর্তন কেবলমাত্র সংগীত হয়ে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না।

শাস্ত্রীয় এবং লৌকিক দুই ধারাই কীর্তনের উপস্থাপনে সমান কার্যকর হয়েছিল। চৈতন্যদেবের অনুচরেরা ছিলেন শাস্ত্রীয় সংগীতে পারদর্শী। তবে শাস্ত্রের বজ্রআঁটুনিতে কীর্তন কখনোই বাঁধা পরেনি। মহাজনেরা বৈষ্ণব পদ রচনার সময় যে সুর-তাল-রাগের আরোপ করেছিলেন তা অক্ষত রাখা কখনোই সম্ভব ছিল না। তবে কীর্তনকে লোকগান বলাও সম্ভব নয়। কারণ বংশপরম্পরায় অথবা গুরু পরম্পরায় কীর্তনের সংগীতে লোকগানের সহজতা যুক্ত হলেও ধ্রুপদী ধারা কখনোই বিলুপ্ত হয়নি। উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও লীলাকীর্তনে *নাট্যশাস্ত্র*-এর সমান্তরালে বাংলার নিজস্ব উপস্থাপনকে বিশেষ গুরুত্ব দিওয়া হয়েছে। লীলাকীর্তন উপস্থাপনে এর গঠনগত দিক বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কীর্তনের বন্দনা, গৌরচন্দ্রিকা, অঙ্গ, ঘরানা, অষ্টকালীয় নিত্যলীলা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করার মধ্য দিয়ে এর উপস্থাপনের গঠনগত কাঠামো পরিস্ফুট হয়েছে।

লীলাকীর্তনের আঙ্গিকে নাটকের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় কী না তা ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর আলোকে দেখানো হয়েছে। কীর্তনের আঙ্গিক গঠনে *নাট্যশাস্ত্র*-এর মতো প্রাচীন নাট্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের ভূমিকা অপরিসীম। ভাষাগত কারণে যদিও *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থটি বিজাতীয় (অর্থাৎ বাংলায় নয় সংস্কৃতে লেখা) তবে ভারতীয় নাট্যধারণা এতে প্রকাশ পেয়েছে। বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞদের নাটকের ধারণা এই গ্রন্থ দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। বিশেষত বৈষ্ণবদের রসশাস্ত্র, নায়ক-নায়িকা বিভাজন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের অনুসরণ করা হয়েছে। সেই অনুসারে চৌষট্টি রসের কীর্তন বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত রয়েছে। একজন কীর্তনীয়া আসরে কীর্তন উপস্থাপনকালে রসপর্যায়ের অবস্থান অনুসারে নায়ক-নায়িকার ভাবগুলো অভিনয়ের (আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক) মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। ভরতমুনি নির্দেশিত ভারতী ও কৈশিকী বৃত্তি কীর্তনে দেখা যায়। উক্ত দুই বৃত্তিতে কথোপকথনমূলক উচ্চণ্ড ও মধুর লাস্যময়ী নৃত্যের সমাবেশ রয়েছে। একজন কীর্তনীয়া একটি পদ উপস্থাপনের সময় সেই রসপর্যায়ের অবস্থানে থাকা নায়ক নায়িকার ভাব অনুসারে অভিনয় করেন। নৃত্য হয়ে ওঠে অভিব্যক্তি প্রকাশের সহায়ক। আয়তনের বিচারে কীর্তনের মঞ্চ অনেকটা ভরত নির্দিষ্ট চতুরস্রের মতো হয়। এইভাবে *নাট্যশাস্ত্র* বর্ণিত রঙ্গালয়, পূর্বরঙ্গ বিধি, অভিনয়, বৃত্তি ইত্যাদি লীলাকীর্তনের উপস্থাপনে দেখতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদের নাট্যতত্ত্ব গ্রন্থ *উজ্জ্বলনীলমণি, নাটক চন্দ্রিকা* ইত্যাদি *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত। এই সকল কারণে *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থটি অনুসরণ করা হয়েছে এবং তা যৌক্তিকও বটে।

এই অধ্যায়ের শেষ অংশে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য অনুসারে পদাবলী কীর্তনের আঙ্গিকগত সাযুজ্য খোঁজ করা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যের যে ব্যাপ্তি ছিল, তা আজকের চিন্তা-চেতনায় ধরা অসম্ভব না হলেও বেশ কঠিন। সংস্কৃতে নাটক ছিল কাব্যের অন্তর্গত। দৃশ্য ও শ্রব্য ভেদে কাব্য দুই প্রকার। দৃশ্যকাব্য ছিল নাটকের নামান্তর মাত্র। দৃশ্যকাব্য রূপক এবং উপরূপকে বিভক্ত। দশটি রূপকের মধ্যে একাঙ্কিক রূপকগুলির (বিশেষভাবে ভাণ, অঙ্ক ও বীথী রূপক) সঙ্গে লীলাকীর্তনের যথেষ্ট মিল রয়েছে। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলার লীলাকীর্তনকে ভাবা যায় কী না তা এই অংশে নিরূপণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে নাটক রূপে কীর্তনের (পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তন) উপস্থাপনভঙ্গি বিশ্লেষণ করা হয়। বর্তমানে একটি কীর্তনের দলে সদস্য সংখ্যা সাধারণত পাঁচ থেকে দশ জন হয়। মূলগায়েন সংগীত ও অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন। নাটকে একজনের বহু ভূমিকায় যুক্ত থাকা এই যুগে অবাস্তব মনে হয়। বর্তমানে বহুচরিত্রের সংলাপময় থিয়েটার উপস্থাপনের সঙ্গে এক দাঁড়িপাল্লায় মাপলে কীর্তনের সঙ্গে সঠিক বিচার করা হবে না। থিয়েটারের উদ্ভব কৃত্যানুষ্ঠানমূলক গীত-নৃত্য-বাদ্যর দ্বারা সূচিত হয়েছিল। কালের প্রবাহে এতে ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠান বাদ গেছে। গীত-নৃত্য-বাদ্যের পরিবর্তে গদ্যসংলাপনির্ভর উপস্থাপনভঙ্গী প্রধান হয়ে উঠেছে। রূপান্তরের এই সকল ধাপ বাংলা তথা ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় সম্পন্ন হয়নি। অন্ততপক্ষে ইংরেজরা যখন ভারতে আসে তখন ধর্মীয়কৃত্যকে বাদ দিয়ে নাট্য-উপস্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। গান, নাচ ও বাদ্যযুক্ত অভিনয় পদ্ধতি তখনও বেশ জনপ্রিয় ছিল। থিয়েটার দেখে নাট্যসংরূপের ধারণা ক্রমাগত পালটে চলেছিল শহুরে শিক্ষিত মানুষের। বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যরূপ অবহেলায় ক্রমেই স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। এই সমস্ত কারণে বাংলা নাটকের ইতিহাস পাঠে এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ আবশ্যক।

কীর্তন একধরনের ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠানমূলক নাট্য-উপস্থাপন। কৃত্যানুষ্ঠান সহযোগে নাটকের উপস্থাপনকে বুঝতে অভিনয় বিদ্যা (Performance Studies)-র তত্ত্ব দিয়ে কীর্তনের যাবতীয় উপস্থাপনের দিকগুলি আলোচনা করা হয়েছে। অভিনেতা রূপে মূলগায়েন এবং দর্শকের আসনে ভক্তবৃন্দকে রেখে তাঁদের অবস্থানগত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করা গেছে। একটি উপস্থাপনের উপাদান হিসেবে স্থান ও কাল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। একই কীর্তন দলের দুই ভিন্ন স্থানে উপস্থাপিত

রাসলীলার পালা ভিন্ন স্বাদের আস্বদ দিতে পারে। এক্ষেত্রে তা দুটি পৃথক পালার মতো আস্বাদ্যমান হয়ে ওঠে। আলোচনার এই অংশে কীর্তনের বিভিন্ন কৃত্যানুষ্ঠান এর উপস্থাপনবৈশিষ্ট্যের নিরিখে বিচার করা হয়েছে এবং নিরূপণ করা হয়েছে তাতে নাট্যগুণ কতটা গাঢ়। তবে ধর্মের সঙ্গে সংঘাত না করেই তা সম্পন্ন হয়েছে।

কীর্তনানুষ্ঠানকে নাট্যানুষ্ঠান রূপে দেখা এই অধ্যায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরণে নাটকের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য কীর্তনানুষ্ঠানের মাধ্যমে খোঁজ করা হয়েছে। মূল গায়েন, ভক্ত-শ্রোতা-দর্শক, নৃত্য, আসর পরিকল্পনা, আলো, বাদ্য ও শব্দ-যন্ত্রাংশ, সাজসজ্জা, প্যারডি গান, স্থান-কালের গুরুত্ব, সংলাপ, নাট্যদ্বন্দ্ব, কাহিনির বিকাশ, হাস্যরসের সঞ্চার ইত্যাদির সাহায্যে উপস্থাপনের নিরিখে কীর্তন যে কতটা নাট্যাঙ্গিক সেই প্রসঙ্গই এখানে উঠে এসেছে। মধ্যযুগের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের কীর্তনানুষ্ঠানের একটি তুলনামূলক আলোচনা এই অধ্যায়ে বিশেষ স্থান পেয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে যে সব পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তনের আসর বসছে তার একটি রূপরেখা এবং তাদের বৈশিষ্ট্যে আলোকপাত করা হয়েছে। পেশাজীবী কীর্তনীয়াদের হাতে কীর্তনের স্বরূপ কীভাবে পাল্টে যাচ্ছে তা এই আলোচনায় উঠে এসেছে। পদাবলী কীর্তনের পাশাপাশি অন্যান্য পালাগানের দলগুলির কথাও এখানে যুক্ত হয়েছে। দূরদর্শন, মুঠোফোন ও আন্তর্জালিক বিভিন্ন গণমাধ্যমের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও কীসের টানে আজও মানুষ পালাকীর্তনের আয়োজন করে চলেছে তার কারণ খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

অন্তিম অধ্যায়ের আলোচনাপর্বে ইংরেজশাসিত বাংলার নব্যগঠিত সমাজব্যবস্থায় বিনোদনমূলক নাট্যসংরূপের বিকাশে পদাবলী ও লীলাকীর্তনের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত বিভিন্ন সংগীত ও নাট্যসংরূপ যেমন কবিগান, খেউড়, ঢপ-কীর্তন, আখড়াই ও টপ্পা গানের আঙ্গিক গঠনে পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তন বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। অনেক সময় কীর্তনের দল ভেঙে উক্ত গানের দল তৈরি হয়েছিল। এই সময় কীর্তনের সাংগীতিক রূপকে বিশেষভাবে অনুকরণ করা হয়েছিল। বাংলা নাটকের ইতিহাসে যাত্রাগানকে প্রাচীন নাট্যসংরূপ বলার পেছনে যে মানসিকতা কাজ করেছিল তা যে ভ্রান্ত পথের নির্দেশ ছাড়া আর কিছু নয়, যুক্তি ও প্রমাণসহ তা ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী

লীলানাট্য এবং লীলাকীর্তন ছিল যাত্রার একটি অন্যতম উৎস। যাত্রা অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত একটি নাট্যসংরূপ। এর আগে যে যাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায় তা ঠিক নাটক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। শোভাযাত্রা অর্থে তা প্রচলিত ছিল। লীলাকীর্তনের পালা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাত্রাপালায় রূপান্তরিত হয়। ড. শশীভূষণ দাশগুপ্তের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উঠে এসেছে সেই অনালোকিত দিক। যাত্রার আঙ্গিক বিকাশে কীর্তন বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল।

বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার প্রবহমান গতি ইংরেজ শাসনব্যবস্থায় শ্লথ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু থেমে যায়নি। ইংরেজদের থিয়েটারও তাল মিলিয়েছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাটকের গানের ঝঙ্কারে। গীতাভিনয়, পৌরাণিক নাটক সেই সত্যকে উজাগর করে রেখেছে। বাংলার বাইরে মণিপুর অঞ্চলে বৈষ্ণবীয় ধারা এবং মণিপুরি সংস্কৃতির মেলবন্ধনে এক বিশেষ নাট্যরূপ উদ্ভূত হয় যা মণিপুরি নাট্য নামে পরিচিত। তাঁদের রাস উৎসবে নৃত্যময় নাট্য উপস্থাপন কীর্তনে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করে। নৃত্যের আধিক্য থাকার দরুণ একসময় বাংলা নাটকে তা আদৃত না হলেও দেশের সর্বত্র এর গ্রহণযোগ্যতা আজ তৈরি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মণিপুরের এই বিশেষ সংস্কৃতি এবং নৃত্যকে অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিলেন। বাংলায় একটি বিশেষ নৃত্য 'গৌড়ীয় নৃত্য' অনেকাংশে মণিপুরি নৃত্যনাট্য এবং বাংলার প্রাচীন নৃত্যশৈলী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। অসমের অঙ্কিয়া নাটের মধ্যেও রয়েছে বাংলা নাট্যধারার প্রাচীন রূপ। এই সকল সংরূপ নিয়ে আলোচনায় কীর্তন সংরূপের আত্তীকরণ কীভাবে ঘটেছিল তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বাংলায় থিয়েটারের রমরমা হলেও বিশেষ বিশেষ নাট্যব্যক্তিত্ব ঐতিহ্যের অনুসন্ধান ও প্রয়োগ নিজের মতো করে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই পথের দিশারী। তিনি জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যপটের ব্যবহার পছন্দ করতেন না। নাটকে দর্শকের কল্পনাশ্রয়ী হয়ে উঠা তাঁর কাছে বিশেষভাবে কাম্য ছিল। তাঁর হৃদয়ে বাংলার কীর্তন গানের বিশেষ স্থান ছিল। কীর্তনে নাটকের বৈশিষ্ট্য যুক্ত থাকার কথা তিনি স্বীকার করেছেন। অন্যদিকে নাটক রূপে যাত্রার উপস্থাপন তাঁর হৃদয় জুড়ে সমাহিত করেছিলেন। *রঙ্গমঞ্চ* প্রবন্ধে রয়েছে তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠের স্বীকৃতি। রবীন্দ্রনাথের নাটকে নাচ ও গানের ব্যবহার ঐতিহ্যবাহী নাটকের উপস্থিতিকেই সমর্থন করে। তাঁর বক্তব্যে ও নাটকের মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণভাবে সাজানো হয়েছে ঐতিহ্যের আন্তরিক অনুসরণ প্রক্রিয়া। পেশাদারি থিয়েটারের উৎকর্ষ বিধানে শিশিরকুমার ভাদুড়ীও

পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যধারার প্রয়োগ দেখা যায় তাঁর নাট্যপরিচালনায়। সর্বশেষে আলোচিত হয়েছে নাট্যকার বাদল সরকার এবং তাঁর প্রসেনিয়াম ভাঙার তীব্র ইচ্ছায় জন্ম নেওয়া থার্ড থিয়েটারের প্রসঙ্গ। মণিপুরি নাট্যের দেহভাষার ব্যবহার সুচারু রূপে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর থার্ড থিয়েটার আদতে ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারাকেই সমর্থন করে। হয়তো এই দু'জনের কেউই পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তনের প্রত্যক্ষ অনুসরণ করেননি। কিন্তু যাত্রা তথা ঐতিহ্যবাহী নাট্যের অনুসরণ করতে কেউই কুণ্ঠাবোধ করেননি। এদিক থেকে বিচার করলে ঐতিহ্যের অনুসরণ কীর্তনের সূত্র সন্ধানের সামিল।

**বাংলা আকর গ্রন্থ**

ওঝা, সুনীলকুমার। (সম্পা.)। *মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল* । শিলিগুরি: উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৭৭।

করিম, মুন্‌শী আব্দুল (সম্পা.) *গোরক্ষ-বিজয়* । কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৯১৮।

কাইউম, মোহম্মদ আবদুল ও সুলতানা, রাজিয়া (সম্পা.)। *আলাওল রচনাবলী*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। ২০০৭।

গোস্বামী, প্রাণগোপাল। *শ্রীশ্রীভক্তি-সন্দর্ভঃ*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্দার। ২০১৮।

গোস্বামী, রাধাবিনোদ। *শ্রীমদ্ভাগবতম্*। দশম স্কন্ধ। কলকাতা: গিরিজা। ২০০৫।

ঘোষ, ঋতদীপ (সম্পা.)। *বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ*। কলকাতা: নাট্যচিন্তা। ২০১৪।

ঘোষ, মুনীন্দ্রকুমার। *কবি সঞ্জয়-বিরচিত মহাভারত*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৯।

চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার। *চর্যাগীতির ভূমিকা* । কলকাতা: ডি.এম, লাইব্রেরি। ২০০৫।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। *ঘরোয়া*। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৩৯৮।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী*। কলকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ। ১২৯১।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সঙ্গীত-চিন্তা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৯৬৬।

দত্ত, সত্যেন্দ্রানাথ। *সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ*। কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেত লিমিটেড। ১৯৯৪।

দাশ, ড. নির্মল। *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০০৫।

দাস, যদুনন্দন। *গোবিন্দলীলামৃত*। কলকাতা: বানেশ্বর ঘোষ এণ্ড কোং—ধন্বন্তরা আশ্রম। ১৯১৩।

দাস, শ্রীকিশোর। *শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর*। কলকাতা: জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট। ২০০৭।

দাশগুপ্ত, জয়ন্তকুমার। *কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ* । কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৯।

নস্কর, সনৎকুমার (সম্পা.)। *কবিকঙ্কন চণ্ডী* । কলকাতা: রত্নাবলী। ১৯৯৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.)। *কাশীদাসী মহাভারত*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ২০১৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.)। *কাশীদাসী মহাভারত*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ২০১৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। *বৈষ্ণব পদসঙ্কলন*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। ১৯৮৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু। *নাটক-চন্দ্রিকা*। কলকাতা: সদেশ। ১৪১৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র। (সম্পা.)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র* । কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন। ২০১৫।

বসাক, ড. রাধাগোবিন্দ (সম্পা.)। *সাতবাহন নরপতি হালের গাথা-সপ্তশতী*। কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অয়ান্ড পাব্লিশার্স। ১৯৫৬।

বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পা.)। *শূন্যপুরাণ রামাইপণ্ডিত প্রণীত*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্। ১৩১৪।

বিদ্যাভূষণ, অনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী। *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*। কলকাতা: গৌড়ীয় মঠ। ৪৪২ গৌরাব্দ।

বিদ্যারত্ন, কালীকিশোর (সম্পা.)। *চৈতন্যমঙ্গল* । কলকাতা: অক্ষয় লাইব্রেরী। ২০১৮।

বিদ্যারত্ন, রামনারায়ণ। *উজ্জ্বলনীলমণিঃ*। কলকাতা: তারা লাইব্রেরী। ২০১৪।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা.)। *জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল*। কলকাতা: রত্নাবলী। ২০১২।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য। *বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকথা* । কলকাতা: বিদ্যা। ২০১৪।

ভট্টাচার্চ, দেবীপ্রসাদ ও রায়, রথীন্দ্রনাথ (সম্পা)। *গিরিশ রচনাবলী*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ১৯৬৯।

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পা.)। *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ১৯৯৬।

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পা.)। *শ্রীকৃষ্ণবিজয়, গুনরাজ খান মালাধর বসু বিরচিত*। কলকাতা: রত্নাবলী। ২০০৩।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ (সম্পা.)। *গোপীচন্দ্রের গান* । কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৯।

ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী (সম্পা.)। *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গল*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১১।

মজুমদার, অতীন্দ্র। *চর্যাপদ* । কলকাতা: নয়া প্রকাশ। ১৯৬১।

মজুমদার, বিমানবিহারী ও মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পা.)। *জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল*। কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০১৬।

মহারাজ, দেবগোস্বামী (সম্পা.)। *শ্রীশিক্ষাষ্টক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা*। নবদ্বীপ: শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ। ২০০৭।

মিত্র, খগেন্দনাথ। *বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ণ)*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯০।

মিত্র, খগেন্দ্রনাথ ও মজুমদার, বিমানবিহারী (সম্পা)। *বিদ্যাপতির পদাবলী*। কলকাতা: কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্। ১৯৫৩।

মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। *মালাধর বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়* । কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১১।

মুখোপাধ্যায়, ড. হরেকৃষ্ণ। *কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০১৫।

মুখোপাধ্যায়, দিলীপ। *বৃহৎ শ্রী শ্রী ভক্তমাল গ্রন্থ*। কলকাতা: অক্ষয় লাইব্রেরী। ২০১৮।

মুখোপাধ্যায়, মহুয়া। *সংগীত দামোদর* । কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০০৯।

মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ ও মজুমদার সুবোধচন্দ্র (সম্পা.)। *শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত*। কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৯৭।

রায়, বসন্তরঞ্জন (সম্পা.)। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৩৪২।

রায়, সতীশচন্দ্র। *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৪১০।

শাস্ত্রী, সীতানাথ আচার্য এবং দাস, দেবকুমার (সম্পা.)। *দশরূপকম্*। কলকাতা: সদেশ। ২০১২।

সান্যাল, অবন্তীকুমার ও চট্টপাধ্যায়, গীরীন্দ্রনাথ। *বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত সাহিত্যদর্পণ*। ২য় খণ্ড। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। ১৩৬৯।

সামন্ত, ড. রবীন্দ্রনাথ (সম্পা.)। *শ্রী গীতগোবিন্দ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৯৪।

সেন, দীনেশচন্দ্র। *মৈমনসিংহ-গীতিকা*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯৩।

সেন, সুকুমার (সঙ্কলিত)। *বৈষ্ণব-পদাবলী*। নিউ দিল্লী: সাহিত্য আকাদেমী। ১৯৫৭।

সেন, সুকুমার (সম্পা.)। *চৈতন্যচরিতামৃত*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৬।

সেন, সুকুমার (সম্পা.)। *চৈতন্যভাগবত*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৫।

সেন, সুকুমার। *চর্যাগীতি-পদাবলী*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৯৫।

সেন, হরিদাসদা। *শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ*। সংস্কৃত বুক ডিপো। ২০১৭।

**সহায়ক গ্রন্থ**

অর্ক, ইউসুফ হাসান। *বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য 'পালাগান': আঙ্গিক বিচার ও 'বর্ণনাকারীর অবস্থান' অনুসন্ধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। ২০১৮।

আল-আমান, আবদুল আজীজ। *পদক্ষেপ*। কলকাতা: এস, মল্লিক। ১৩৭১।

আল দীন, সেলিম। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য* । ঢাকা: বাংলা একাদেমী ঢাকা। ১৯৯৬।

আলী, মোঃ ফজলুল এবং অন্যান্য। *গবেষণা পদ্ধতি ও পরিসংখ্যান*। ঢাকা: চয়নিকা। ২০১৫।

ইসলাম, শেখ মকবুল। *চৈতন্যমহাপ্রভু ও লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ২০১২।

কানুনগো, সুনীতিভূষণ। *বাংলায় বৈষ্ণব আন্দোলন*। ঢাকা: বাতিঘর। ২০২১।

কুনডু, মণীন্দ্রলাল। *বাঙালির নাট্যচেতনার ক্রমবিকাশ* । কলকাতা: সাহিত্যলোক। ২০০০।

খান, শামসুজ্জমান। *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য*। দ্বিতীয় খণ্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। ২০১৮।

খান, শামসুজ্জমান। *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য*। প্রথম খণ্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। ২০১৭।

গঙ্গোপাধ্যায়, ড. শম্ভুনাথ। *মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৯৪।

গিরি, ড. সত্যবতী ও মজুমদার, ড. সমরেশ। *প্রবন্ধ সঞ্চয়ন*। কলকাতা: রত্নাবলী। ২০০৯।

গিরি, সত্য। *বৈষ্ণব পদাবলী*। কলকাতা: রত্নাবলী। ২০০৫।

গিরি, সত্যবতী। *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০০৭।

গুপ্ত, ক্ষেত্র। *বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ। ২০০২।

গোলদার, ড. তানিয়া। *লোকনাট্যের নারীশিল্পীরা*। বীরিভূম: রাঢ় প্রকাশন। ১৪২২।

গোস্বামী, প্রভাতকুমার। *বাংলা নাটকে গান*। কলকাতা: ক্লাসিক প্রেস। ১৩৭১।

গোস্বামী, প্রভাতকুমার। *ভারতীয় সঙ্গীতের কথা*। কলকাতা: আদি নাথ ব্রাদার্স। ২০১৮।

গোস্বামী, সনাতন। *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়*। কলকাতা: শম্পা বুক হোম। ২০০২।

ঘোষ, ড. অজিতকুমার। *নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০০৭।

ঘোষ, ড. অজিতকুমার। *বাংলা নাটকের ইতিহাস* । কলকাতা: দেজ। ২০০৫।

ঘোষ, ড. ললিতা। *অসমের সত্রিয়া নৃত্যের ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: কলাবতী মুদ্রা। ২০২১।

ঘোষ, ড. সতী। *ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী তুলনামূলক আলোচনা*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। ১৯৮৪।

ঘোষ, বারিদবরণ। *নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস*। কলকাতা: শ্রী পাবলিশিং হাউস। ২০১১।

চক্রবর্তী জনার্দন। *শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য-সংস্কৃতি*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯৭।

চক্রবর্তী, ড. মৃগাঙ্কশেখর। *বাংলার কীর্তন গান*। কলকাতা: সাহিত্যলোক। ১৯৯৮।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার। *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ* । কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। ২০১২।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার। *বাংলার লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৯৭।

চক্রবর্তী, রথীন। *কলকাতার নাট্যচর্চা।* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৯১।

চক্রবর্তী, রমাকান্ত। *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*। চতুর্থ মুদ্রণ। কলকাতা: আনন্দ। ২০১১।

চক্রবর্তী, স্মৃতিকণা। *মঙ্গলকাব্য : পুচ্ছগ্রাহিতা ও মৌলিকতা* । কলকাতা: বিদ্যা। ২০১১।

চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম। *বাংলা নাটকে রবীন্দ্রনাথ গণনাট্য ও শম্ভু মিত্র*। কলকাতা: পুস্তক বিপণী। ১৯৯৭।

চট্টোপাধ্যায়, মুনমুন। *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে নাট্যপ্রসঙ্গ ও নাট্য উপাদান* । কলকাতা: পুস্তক বিপণী। ১৯৯৯।

চৌধুরী, আবুল আহসান (সম্পা.)। *রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি*। ঢাকা: অন্বেষা। ২০১৪।

চৌধুরী, দর্শন। *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস*। কলকাতা: পুস্তক বিপণী। ১৯৯৫।

চৌধুরী, দুলাল। *বাংলার লোকউৎসব*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৮৫।

চৌধুরী, ভূদেব। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*। দ্বিতীয় পর্যায়। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০০৬।

চৌধুরী, ভূদেব। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*। প্রথম পর্যায়। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ১৯৫৪।

জাকারিয়া, সাইমন ও মুর্তুজা, নাজমীন। (সম্পা.)। *বাংলা সাহিত্যের অলিখিত ইতিহাস*। ঢাকা: অ্যাডার্ন পাবলিকেশন। ২০১০।

জাকারিয়া, সাইমন। *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী ঢাকা। ২০০৭।

জাকারিয়া, সাইমন। *বাংলাদেশের লোকনাটক: বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। ২০০৮।

জানা, ড. নরেশচন্দ্র। *গাথাসপ্তশতী ও বৈষ্ণব পদাবলী*। কলকাতা: সাহিত্যলোক। ১৯৮৬।

জানা, নরেশ্চন্দ্র (সম্পা.)। *বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো। ২০১৫।

দত্ত, ড. দিলীপকুমার। *বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোক।* উ. ২৪ পরগণা: প্রভা প্রকাশনী।

দাশগুপ্ত, নলিনীনাথ। *বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ। ২০০১।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *বাংলা সাহিত্যের নবযুগ*। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। ১৩৩৮।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*। কলকাতা: ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি। ১৩৯০।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে*। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। ২০০৬।

দাস, পরিতোষ। *সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম*। কলিকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৭৮।

দাস, প্রভাতকুমার (সম্পা.)। *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি। ১৯৯৬।

দাস, মন্মথ (সংগ্রাহক)। *শ্রীশ্রীবৈষ্ণবব্রত ও মাহাত্ম্য সংগ্রহ*। কলকাতা: সদেশ। ১৪১৩।

প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ। ১৯৭০।

বক্সী, কৃষ্ণা। *কীর্তন গানের ইতিহাস*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ২০১৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুন্ধতী। *বাংলার লোকনাট্য যাত্রা ও সাতটি রবীন্দ্র নাটক*। কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩৯৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: মর্ডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। ২০১৬-১৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত্ (সম্পা.)। *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০০৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত্। *বাংলার মঞ্চগীতি (১৭৯৫-১৮৭২)*। কলকাতা: সুবর্ণরেখা। ১৯৯৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। *চৈতন্যদেব*। কলকাতা: প্যাপিরাস। ২০০৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। *রাজসভার কবি ও কাব্য*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ২০০৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ। *বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ২০১১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রুতি। *নৃত্য: অন্তরে বাহিরে*। কলকাতা: কারিগর। ২০১৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৬।

বসু, তাপস (সম্পা.)। *ইতিহাস পুরুষ শ্রীচৈতন্য: গণআন্দোলনের পুরোধা*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ১৯৮৬।

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। *মধ্যযুগের কবি ও কাব্য*। কলকাতা: ভারতী বুক স্টল। ১৯৬১।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ২০০২।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*। কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ এবং সপতর্ষি প্রকাশন। ২০১৫।

ভট্টাচার্য, কুমুদরঞ্জন। *সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান*। কলকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৭৮।

ভট্টাচার্য, গৌরীশংকর। *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা* । কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৪০৭।

ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.)। *চৈতন্য প্রসঙ্গ*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৪২১।

ভট্টাচার্য, ড. হংসনারায়ণ। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারা*। কলকাতা: হাউস অব বুকস্। ১৯৫৭।

ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। *ভারতীয় ভক্তি-সাহিত্য*। কলকাতা: লেখাপড়া। ১৯৬১।

ভট্টাচার্য, ষষ্ঠীচরণ। *বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি*। কলকাতা: পুনশ্চ। ২০০১।

ভট্টাচার্য্য, সুমন। *কীর্তন ও পদ প্রসঙ্গে*। কলকাতা: রংবেরং পাবলিকেশন। ১৪২৩।

ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ। *চৈতন্যদেব*। কলকাতা: পত্রলেখা। ২০১২।

ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ। *দেবতার মানবায়ন*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১০।

মজুমদার, বিমানবিহারী। *পাঁচশত বৎসরের পদাবলী*। কলকাতা: জিজ্ঞাসা। ১৩৯৮।

মজুমদার, ভবেশ। *জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ২০১৮।

মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। *কীর্তন*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১৩৫২।

মুখোপাধ্যায়, অশোক। *সংসদ বানান অভিধান*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ২০১৭।

মুখোপাধ্যায়, ড. শঙ্কর লাল। *ভারতীয় নৃত্য ধারার সমীক্ষা*। কলকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৯৭।

মুখোপাধ্যায়, মহুয়া। *গৌড়ীয় নৃত্য প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নাট্যধারা* । কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০১৭।

মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। *বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। ২০১১।

মুখোপাধ্যায়, সুখময়। *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেতথ্য ও কালক্রম*। কলকাতা: ভারতী বুক স্টল। ১৯৯৩।

মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা*। কলকাতা: জিজ্ঞাসা। ১৯৭০।

মুরশিদ, গোলাম। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। ঢাকা: অবসর। ২০১৯।

মৈত্র, সুরেশচন্দ্র। *বাংলা নাটকের বিবর্তন* । কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। ১৯৭৩।

রক্ষিত, মলয়। *বাংলা থিয়েটার অন্য ইতিহাস*। কলকাতা: সিগনেট প্রেস। ২০১৭।

রায়, জয়ন্ত (সম্পা.)। *কীর্তন কথা*। কলকাতা: পত্রলেখা। ২০১৯।

রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস* । আদিপর্ব। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০১৪।

রায়, নীহাররঞ্জন। *রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: দি বুক এম্পরিঅম লিমিটেড। ১৩৫৩।

রায়, বিশ্বনাথ ও রায়, ছন্দা (সম্পা.)। *বাংলা লোকনাট্য নাটক ও রঙ্গমঞ্চ* । কলকাতা: এবং মুশায়েরা। ২০১৬।

রায়, মন্দিরা। *প্রসঙ্গ: বাংলা রঙ্গালয়*। কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ। ১৪১৭।

রায়চৌধুরী, সুবীর (সম্পা.)। *বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ১৯৯৯।

শরীফ, আহমদ। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*। ঢাকা: নিউ এজ। ২০১১।

শরীফ, আহমদ। *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*। ঢাকা: সময় প্রকাশন। ২০০৪।

শীল, বৈদ্যনাথ। *বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা* । কলকাতা:এ. কে. সরকার অ্যান্ড কোং। ১৯৫৮।

সরকার, পবিত্র। *নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০১৬।

সাঈদ, শামসুল আলম। *পদাবলী সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ*। ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন। ২০১২।

সান্যাল, অবন্তীকুমার। *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব*। কলকাতা: রূপলেখা প্রকাশনী। ২০০৯-১০।

সান্যাল, হিতেশরঞ্জন। *বাংলা কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: কে পি অ্যান্ড কোম্পানী। ২০১২।

সাহা, ড. ধীরেন্দ্রনাথ। *বৈষ্ণব পদাবলী: পদ ও পদকার*। কলকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮৬।

সেন, অঞ্জন। *বঙ্গশিল্পে চৈতন্যদেব*। কলকাতা: পত্রলেখা। ২০১৩।

সেন, দীনেশচন্দ্র। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*। কলকাতা: সান্যাল এণ্ড কোম্পানি। ১৩৬৭।

সেন, সুকুমার। *চৈতন্যাবদান*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮৬।

সেন, সুকুমার। *নট নাট্য নাটক*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ। ১৯৭২।

সেন, সুকুমার। *প্রবন্ধ সংকলন*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৪।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫।

সেন, সুকুমার। *ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: ভারবি। ১৯৯২।

সেন, সুকুমার। *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী* । কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১৯৪৬।

সেনগুপ্ত, পল্লব এবং অন্যান্য। *গৌড়ীয় নৃত্য : নিবন্ধগুচ্ছ* । কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০০৫।

হালদার, গোপাল। *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা*। কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী। ১৪১৯।

**ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ**

Acharyya, Deb Narayan. *THE LIFE AND TIMES OF SRIKRISHNA-CHAITANYA*. Calcutta: Firma KLM Private Limited. 1984.

Alexander, Jeffrey C. *Cultural Pragmatics: Social Performance between Ritual and Strategy*. vol-22. American Sociological Association. 2004.

Chakravarti, Janardan. *BENGAL VAISHNAVISM AND SRI CHAITANYA*. Kolkata: The Asiatic Society. 2016.

Chakravarti, Ramakanta.. *Vaisnavism on Bengal*. vol-II. kolkata: Sanskrit pustak bhandar. 1985.

Chatterjee, Chinmoy. *Studies in the Evolution of Bhakti Cult with Special Reference to Vallabha School*. Kolkata: Jadavpur University.

Coomarswamay, Ananda and Duggirala, Gopala Kristnayya. *The Mirror of Gesture*. London: Harvard University press. 1917.

Das, Sisirkumar. *THE MAD LOVER*. Calcutta: Papyrus. 1984.

Dasgupta, Hemendranath. *The Indian Stage*. Calcutta: Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd. 1934.

Dey, Sushil Kumar. *Early History of The Vaishnava Faith and Movement In Bengal*. Firma KLM Private Limited. 1986.

J. Mc Cutchion, David. *LATE MEDIAEVAL TEMPLES OF BENGAL*. Kolkata: The Asiatic Society. 2017.

Narasimhachary, M. *Makers of Indian Literature Sri Ramanuja*. Kolkata: Sahitya Akademy. 2018.

Schechner, Richard. *PERFORMANCE STUDIES: An Introduction*. New York: Routledge. 2013.

Sen, Rai Saheb Dinesh Chandra. *CHAITANYA AND HIS COMPANIONS*. Kolkata: University of Calcutta. 1917.

Sen, Rai Saheb Dinesh Chandra. *THE VAISNAVA LITERATURE OF MEDIAEVAL BENGAL*. Kolkata: University of Calcutta. 1917.

Turner, Victor. *From Ritual to Theatre*. New York: PAJ Publications. 2002.

**পত্রিকা**

আহমদ, আফসার। "বাংলা নাটকের হাজার বছর"। *নাট্যকলা-৮*। কলকাতা: নাট্যবিভাগ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৯।

খান, অন্বেষা। "লোক ঐতিহ্যের আঙিনায় কৃষ্ণকীর্তন থেকে রামপাঁচালী"। *হান্ড্রেড মাইলস কবিতা ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক পত্রিকা*। ষষ্ঠ বর্ষ। কলকাতা: হান্ড্রেড মাইলস। ২০১৬।

গিরি, সত্য। "গৌড়ীয় ও অসমীয় বৈষ্ণব পদাবলী: তুলনার নিরিখে"। *তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য পত্রিকা*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৯

গোস্বামী, কাননবিহারী। "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কৃত, বাংলা ও ব্রজবুলি সাহিত্যে নৃত্যে নায়কের ভূমিকা"। *নৃত্যরসমঞ্জরী*। ষষ্ঠ বর্ষ। কলকাতা: বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৮

ঘোষ, চৈতালী। "মণিপুরী নৃত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও ক্রমবিকাশ"। *নৃত্যরসমঞ্জরী*। তৃতীয় বর্ষ। কলকাতা: বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৫

ঘোষ, ড. প্রদীপ কুমার। "প্রসঙ্গ: বাংলা কীর্তন"। *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা*। ষষ্ঠ সংখ্যা। কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ২০০৪।

ঘোষ, ড. প্রদীপ কুমার। "ভারতীয় সংগীতে ঘরানার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ"। *সংগীত আকাদেমি পত্রিকা*। সপ্তম সংখ্যা। কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ২০০৫।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। "সঙ্গীত"। *সংগীত আকাদেমি পত্রিকা*। সপ্তম সংখ্যা। কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ২০০৫।

দাস, প্রভাত কুমার। "নতুন নাট্যকারের সন্ধানে: শিশির কুমার"। *এবং নাট্যকথা*। কলকাতা: নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগ। ২০১৪।

দাস, ব্রজরাখাল। "পদাবলী কীর্ত্তন সঙ্গীতে মৃদঙ্গ করতাল ও সুরযন্ত্র ব্যবহার"। *নৃত্যরসমঞ্জরী*। ষষ্ঠ বর্ষ। কলকাতা: বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৮

দাস, ব্রজরাখাল। "শ্রীখোলবাদ্যের ও পদাবলী কীর্ত্তনের তাল পদ্ধত"। *নৃত্যরসমঞ্জরী*। তৃতীয় বর্ষ। কলকাতা: বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৫

দে, তরুণকুমার। "যাত্রা ও নাটক ১৯৬৬ থতকে ১৯৮৫"। *এবং নাট্যকথা*। কলকাতা: নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগ। ২০১৪।

নস্কর, সনৎকুমার। "গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন: একটি আপেক্ষিক তৌলন"।*তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য পত্রিকা*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৯

প্রধান, ড. তরুণ। "বাংলা থিয়েটারে লোকনাট্যের প্রভাব"। *নাট্যকলা-৮*। কলকাতা: নাট্যবিভাগ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৯।

বসু, সৌমিত্র। "বাংলা থিয়েটার ও বাঙালি দর্শক"। *সাহিত্যতক্কো*। দ্বিতীয় সংখ্যা। কলকাতা: মিলেনিয়াম প্রিন্টার্স। ২০১৩।

বসু, সৌমিত্র। "বাংলা পৌরাণিক নাটকের পালাবদল"। *এবং নাট্যকথা*। কলকাতা: নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগ। ২০১৪।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য। "বাংলার লোকনাট্য: লক্ষণ বিচার ও বৈশিষ্ট্য সন্ধান"। *লোক-সাংস্কৃতিক প্রবন্ধ সংকলন*। কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া। ২০০৮।

মণ্ডল, সুজিত কুমার। "বাংলা ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা: সংরূপের সন্ধানে পালাগান"। *বহুরূপী*। ১১৮ সংখ্যা। ২০১২

মিত্র রায়চৌধুরী, কঙ্কনা। "বাংলা কীর্তনের ক্রমবিকাশ"। *সংগীত আকাদেমি পত্রিকা*। নবম সংখ্যা। কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ২০১০।

মুখোপাধ্যায়, ড. মহুয়া। "ভারতীয় সংগীতে বিশেষত নৃত্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম তথা চৈতন্যদেবের প্রভাব"। *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা*। দ্বিতীয় সংখ্যা। কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ১৯৯৮।

মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার। "সংগীত ও বাংলার নাট্যশালা: (গিরিশ যুগ)"। *সংগীত আকাদেমি পত্রিকা*। নবম সংখ্যা। কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ২০১০।

মুখোপাধ্যায়, মহুয়া। "গৌড়ীয় নৃত্য ও নাট্যশাস্ত্র"।*পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি পত্রিকা*। ষষ্ঠ সংখ্যা। কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ২০০৪।

মুখোপাধ্যায়, মহুয়া। "গৌড়ীয় নৃত্যকলা: স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের আন্তঃসম্পর্ক"। *নৃত্যরসমঞ্জরী*। তৃতীয় বর্ষ। কলকাতা: বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৫

রক্ষিত, মলয়। "ঔপনিবেশিক থিয়েটার, বাঙালির সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ ও রবীন্দ্রনাথ"। *পরিকথা*। চতুর্দশ বর্ষ। ২০১১

রায়চৌধুরী, মুরারি। "থিয়েটারে সংগীত"। *এবং নাট্যকথা*। কলকাতা: নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগ। ২০১৪।

সেনগুপ্ত, তপা। "মণিপুরে বৈষ্ণবধর্মের প্রবহমানতা"। *নৃত্যরসমঞ্জরী*। ষষ্ঠ বর্ষ। কলকাতা: বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৮

| | |
|---|---|
| NIHAR RANJAN MANDAL | DR. SUJIT KUMAR MANDAL |
| Signature of Researcher | Signature of Supervisor |
| Date: | Date: |